২০৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP. 07 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৩ ...

শিক্ষা ।। জ্ঞান ও আদর্শহীনতা

শিক্ষা যদি জ্ঞান না বাড়ায় তাহলে যে সমস্যাগুলো হতে পারে তার সবক'টির প্রকোপেই ভুগছে এখন বাংলাদেশ। সংসদ থেকে সচিবালয়, শিল্প বাণিজ্য থেকে নিয়ে শিক্ষাঙ্গন পর্যন্ত সর্বত্রই যে অন্যরকম একটা সংস্কৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, সে বিষয়ে কেউই নিশ্চয়ই দ্বিমত পোষণ করবেন না। দ্বিমত পোষণের উপায়ও নেই। কেননা এমন সব উদাহরণ সৃষ্টি হচ্ছে যেগুলো সভ্য হওয়ার দাবি এবং শালীনতার মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করছে। উঁচু ডিগ্রীধারী লোকজনকেও দেখা যাচ্ছে নির্জ্ঞানের মতো আচরণ করতে; এমন সব শব্দ-বাক্য তাঁদের মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে উচ্চারিত হয় যে, তা শুনলে মনে হবে অর্বাচীন ও নির্জ্ঞান কোন সমাজের কৌপীন সর্বস্ব মানুষ তারা। কিন্তু না, বেশভূষায়

আবীর হাসান

তাঁরা মার্জিত। অর্থাৎ খোলস এক রকম আর ভিতরের সংস্কৃতি অন্য রকম। আর এসব লোকজন যে চাপল্যের বয়সে রয়েছেন তাও নয়, পরিণত ও যুক্তির বয়সে উপনীত হয়েছেন বেশ আগেই। কাজেই এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, শুধু তারুণ্যই কুশিক্ষার জন্য বেপথু হচ্ছে। বস্তুত এই প্রক্রিয়াটা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে– অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষকে আর জ্ঞানী করতে পারছে না। অতিমানব না হোক অন্তত যতটা শিক্ষা পেলে মানুষ মূল্যবোধের ধারক, যুক্তিবাদী ন্যায় নিষ্ঠ, লঘু-গুরু জ্ঞানসম্পন্ন ও দেশপ্রেমী হতে পারে তার চেয়ে বেশি শিক্ষা পেয়েও কিন্তু অনেককেই দেখা যাচ্ছে অস্বাভাবিক আচরণ করতে। অবশ্য যাঁরা এমন আচরণ করছেন তাঁরা একে অস্বাভাবিক মনে করছেন না। এর মানে হচ্ছে, যে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন তা তাঁদের বিবেককে জাগাতে পারছে না।

মাঝে মাঝেই বিভিন্ন সভায় বা আলোচনা অনুষ্ঠানে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের অসঙ্গতিগুলো নিয়ে আলোচনা হয় এবং সামান্য ক'জন বিদগ্ধ মানুষকেই বার বার ঘুরেফিরে একই কথা বলতে শোনা যায়। মাঝে মাঝে কঠোর সমালোচনাও তাঁরা করেন, সাধারণ মানুষ মনে করে– এবার হয়ত ব্যতিক্রমী কিছু ঘটবে, রাজনীতিবিদসহ সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা শিষ্ট আচরণ করবেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, উল্টোটা হতে। যাঁদের উদ্দেশ করে বলা হয় তাঁরা গায়েই মাখেন না। এমনকি অনেক সময়ই দেখা যায় শিক্ষকদের উদ্দেশ করে বলা অনেক কথাই শিক্ষকরা গায়ে মাখেন না। অথচ তাঁরা যে জানেন না শিক্ষার মান অবনতিশীল বলেই সমাজে রাজনীতিতে অর্থনীতিতে অসঙ্গত ঘটনা ঘটছে, তা নয়। তবে একটা কথা যে অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। সেটি হচ্ছে, শিক্ষকতা নিরন্তর জ্ঞান চর্চার পেশা।

সাম্প্রতিক এক গবেষণা রিপোর্টের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠানে ১৯৮৭ সালের এক জরিপে তথ্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৫৭ শিক্ষকের মধ্যে ২৮৮ শিক্ষকের কার্ড পাওয়া গিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে। কার্ডধারীরাও আবার বেশির ভাগই গল্প-উপন্যাসের বই নিয়েছেন। তাঁদের কোর্স সংক্রান্ত বই নেননি। এর অর্থ হচ্ছে অধিকাংশ শিক্ষক জ্ঞানচর্চার আগ্রহী নন। এদের কাছ থেকে শিক্ষা পাচ্ছে যে ছাত্ররা তাদের জ্ঞানের বহর কত তা সহজেই অনুমেয়। এক প্রবীণ শিক্ষাবিদ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যতই বাড় ক শিক্ষার মান বাড়ছে কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। তিনি বলেছেন, উচ্চশিক্ষায় ফাঁকি ঢুকে পড়েছে। ছাত্ররা টেক্সট বই পড়ে না, নোট মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করে। শিক্ষকরাও ছাত্রদের ফাঁকির সুযোগ করে দিচ্ছেন নানাভাবে। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই আসলে দাঁড়িয়ে আছে ফাঁকির ওপর।

খুবই চাঁছাছোলা কথা। তবে শুধু এটুকুই নয় জরিপে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা বলেছে, শিক্ষকরা ক্লাসে দেরিতে আসেন এবং লেকচার শুরু করার আগে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করেন।

বস্তুত এখানেও আদর্শ ও মূল্যবোধের বিষয়টি জড়িত। ছাত্রছাত্রীরা যাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে তার সবটাই কি অপ্রাসঙ্গিক?

এ প্রশ্ন তোলার কারণ, সামাজিক মূল্যবোধ এখন এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নোট বা সাজেশন ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা অন্য বিষয়কে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে। শিক্ষকরা জ্ঞানের কথা বললেই পাঠক্রমের বাইরের কিছু হলেই তাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করা হয়। সাহিত্য, দর্শন শিল্পকলা এমনকি বিজ্ঞান বা অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়েও পাঠক্রমের বাইরের অনেক কিছু জানা প্রয়োজন। কিন্তু সে সব জানার দিকে তেমন একটা আগ্রহ নেই। সে কারণে সামাজিকভাবে বা বিভিন্ন বেসরকারী পেশাগত পরিসরে প্রবীণ অথবা কম ডিগ্রীধারীদের যত গুরুত্ব দেয়া হয় নতুন খুবই ভাল ফল অর্জনকারীদের মূল্যায়ন তেমনভাবে করা হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চ ডিগ্রীধারীকেও দেখা যায় সাধারণ জ্ঞানহীন, সামাজিক মূল্যবোধহীন এবং আদর্শহীন হতে। এ ধরনের শিক্ষিত লোক কোন কাজেই তেমন দক্ষ হতে পারে না, শিক্ষকতাতেও দক্ষ হবে এমন মনে করার কারণ নেই। হচ্ছেও না।

আসলে জ্ঞানচর্চাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা বহুদিন থেকেই চলছে। না, আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ শুরু না করলেও শুরু হয়ে গেছে। আশির দশকে পেট্রোডলার মধ্যবিত্তের মধ্যে যে অসম প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল তার প্রকোপেই আসলে মূল্যবোধগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত ব্যক্তিরাও যোগ দিয়েছিলেন ঐ ইঁদুর দৌড়ে। সামরিক স্বৈরাচার রাজনীতিতেও দুর্বৃত্তায়ন করেছিল পরিকল্পিতভাবেই। ফলে মধ্যবিত্ত সমাজটাই ভেঙ্গে পড়েছিল। সেই "সরল জীবন আর উঁচু চিন্তারা" মধ্যবিত্তকে এখন বাংলাদেশে খুবই কম খুঁজে পাওয়া যাবে। অথচ এদের প্রয়োজন সব দেশেই আছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বা ভাল গণতন্ত্রের দেশগুলোতেও দেখা যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড সোজা রাখে। রস পেরোরের মতো লোকরা খুব কমই রাজনীতিতে আসেন। গণতান্ত্রিক রাজনীতিটা এই পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে এখনও পুঁজির মালিকদের হাতে যায়নি বরং পুঁজিবাদের সমর্থক মধ্যবিত্তের হাতেই রয়েছে। আর এ কারণেই পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে থেকেও "কল্যাণ রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে। এখানকার মতো যুগপৎ বাণিজ্য পুঁজির মালিক হওয়া এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালী হওয়ার প্রবণতা খুব কম দেশের মধ্যবিত্তের মধ্যেই আছে। এই মধ্যবিত্তের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকও পড়েন। শিক্ষকদের বেশির ভাগই এখন আর শিক্ষক বলে সরল জীবনযাপন করতে রাজি নন। তাঁরাও শিল্পপতিদের মতো বিলাসী জীবনযাপন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছেন।

শুধু তো শিক্ষক নন মধ্যবিত্ত থাকার মতো যতগুলো পেশা আছে সে পেশাগুলোর কেউই আর এদেশে মধ্যবিত্ত থাকতে চান না। তবে শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী যাঁদের ওপর সভ্যতা নির্ভরশীল তাঁরা গড্ডলিকায় গা ভাসিয়ে দিলে সমস্যা তো দেখা দেবেই। কারণ পেশাজীবীরা যদি ঠিকাদারীর মতো কাজও করতে যান তাহলে পেশার উৎকর্ষ সাধনের সময় তাঁরা পাবেন কোথায়? সমস্যাটা হচ্ছে পেশাজীবী মধ্যবিত্ত, তাঁদের পেশার আয়ে সন্তুষ্ট নন। এই অসন্তুষ্টি থেকেই নানান উপসর্গ দেখা দিয়েছে। সন্ত্রাস ঐতিহ্য বিনষ্ট করছে এবং দেখা যাচ্ছে এ সন্ত্রাসের সঙ্গেও কতিপয় ক্ষেত্রে শুধু ছাত্র নয়, শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লোকজনও জড়িত হয়ে পড়ছে।

তবে শিক্ষার মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটাই প্রধান সমস্যা নয়। জ্ঞানের ভিত্তি, আদর্শ এবং নিষ্ঠার অভাবটাকেই প্রবল বলে মনে হচ্ছে এবং দীর্ঘদিন ধরে এই প্রক্রিয়ায় চলার ফলে একদেশদর্শী একটি প্রজন্মের সৃষ্টি হয়েছে, যে প্রজন্মের মানুষ শিক্ষকতাসহ সকল পেশাতেই আছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের জ্ঞানভিত্তিক সমাজের জন্য এমন নির্জ্ঞান মানুষের অস্তিত্ব জাতির জন্য বিপজ্জনকই বটে। কারণ ভাল ফল করা ছাত্রছাত্রীদের যদি সঠিক কাজে লাগানো না যায় তাহলে যে কোন আধুনিক প্রতিষ্ঠান চালাতেই যে সমস্যা হবে– তা বলাই বাহুল্য। এখনি তার কিছু কিছু আলামত দেখা যাচ্ছে। সমাজে এখনও কিছু বিবেকবান মানুষ আছেন বলে তাঁরা নৈতিকতার প্রশ্ন তুলছেন। কিন্তু এভাবে আর কিছুদিন চলতে থাকলে এ কথাগুলো বলার মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

বস্তুত সমাজ রাজনীতি যেভাবেই চলুক শিক্ষক সমাজকে একটা ন্যূনতম আদর্শ নিয়ে থাকতে হবে। ভিন্ন স্রোতে চলা কতটা সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে তা তাঁদেরকে জ্ঞানের কষ্টিপাথরেই যাচাই করতে হবে। অবশ্যই কিছুটা বেশি দায়িত্ব সবসময়ই শিক্ষক সমাজের ওপর বর্তায়– এখনও বর্তাচ্ছে। ফাঁকির ওপর এইভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে থাকলে এক নির্বোধ মানবতাহীন প্রজন্মের উদ্ভব হবে। যারা সহজে বড় বড় ডিগ্রী বাগাবে কিন্তু বাহ্যজ্ঞানহীন হবে। এখনই এদের কিছু কিছুর দেখা পাওয়া যাচ্ছে। যৌতুকের জন্য, পুত্র সন্তানের জন্য, বিলাসদ্রব্য পাওয়ার জন্য যে লিপ্সা এবং অমানবিক হয়ে ওঠা তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষ মানুষ দেখা যাচ্ছে– এতো এই ফাঁকির শিক্ষার জন্যই। শিক্ষিত কিন্তু চেতনাহীন নারীও সমস্যার সৃষ্টি করছে। ভাল বাবা-মা খুঁজে পাওয়াও এখন কঠিন। অথচ এদের ওপরই আমরা ভরসা করে আছি– এরাই সমাজ বদলে দেবে, আধুনিক রাষ্ট্র গড়বে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়– কারণ ফাঁকির শিক্ষা অথবা জ্ঞানহীন শিক্ষা এদেরকে অশিক্ষিত মানুষের চেয়ে কিছুটা বেশি চালাকি শেখাচ্ছে। অন্তত অর্থগৃধ্নুতা ও অন্যায়কে বৈধতা দেয়ার কৌশল শেখাচ্ছে। এই কৌশলটাই আসলে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার বদলে পিছিয়ে দিচ্ছে। এখন যেখানে অন্যান্য দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আগামী শতকে বৈষম্যহীন এক নব্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখছে, আমাদের সেখানে পিছিয়ে পড়ার চিন্তা করতে হচ্ছে। এখন তাই একটিই প্রত্যাশা– জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা চাই।

তথ্যচিত্র

- বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি এ দেশের ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ক্রমশই কমছে। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষার্থী ছিলেন মাত্র ২০ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গত বছর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় ছিলেন ৩৩ দশমিক ০৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। বিশেষ করে এসএসসি পাস করার পরে বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা অনিচ্ছুক হয়ে পড়ছে।
- একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত এক সেমিনারে বক্তারা সম্প্রতি বলেন, রাজনীতিবিদদের কোনও আগ্রহ নেই শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানোর।
- বর্তমানে দেশের ৯০টি কলেজে অনার্স কোর্স রয়েছে। যে সব কলেজে অনার্স চালু রয়েছে বা চালু করার প্রক্রিয়া চলছে সেগুলোর প্রায় অর্ধেক এ কোর্স চালুর উপযোগী নয়।
- সম্প্রতি দেশের ৫শ' সরকারী ও বেসরকারী কলেজের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় তিন কোটি টাকার বই কিনছে।
- বিশ্ব ব্যাংক মিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার মান ও কারিকুলাম সন্তোষজনক নয়। এ মিশনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং শিক্ষার প্রসারে অর্থ সাহায্য করা। কিন্তু প্রতিবেদন 'হতাশাজনক' হওয়ায় তাঁরা শিক্ষার উন্নয়নে এনজিও'দের ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দিয়েছে।
- বিশ্বব্যাংকের শিক্ষা খাত বিষয়ক রিপোর্ট সম্পর্কে তাদের প্রতিনিধি ও এফবিসিসিআই প্রতিনিধিদের মতবিনিময় ও পর্যালোচনায় মন্তব্য করা হয় ঃ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে। দেশের প্রতিটি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় দলীয় কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- সম্প্রতি সরকার বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের এক শ' ভাগই দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুরুতে এই অংশের পরিমাণ ছিল মূল বেতনের ২০ ভাগ। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আশির দশকে তা ৫০ ভাগে উন্নীত করা হয়। পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে তা ৮০ ভাগে উন্নীত করা হয়েছিল।

– রিসার্চ রেফারেন্স সেল, দৈনিক জনকণ্ঠ